সাহিত্যিকরা অসামান্য নৈপুণ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন মন্বন্তরকে

দুঃসময়ের দিনলিপি

■ **বিপন্ন:** ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। ছবি *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র আর্কাইভস থেকে

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

১৯৪৩-এর মন্বন্তরের আশি বছর পূর্ণ হল। ১৯৪৪-এ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার গঠিত ফ্যামিন ইনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী অবিভক্ত বাংলায় এই মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিলেন পনেরো লক্ষ মানুষ, যদিও পরবর্তী কালে অমর্ত্য সেন সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ত্রিশ লক্ষ। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, এই মন্বন্তর ছিল সম্পূর্ণ 'ম্যান-মেড'; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির শক্তিবৃদ্ধি করতে ব্রিটিশ সরকারের গ্রহণ করা একাধিক নীতি— ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের খাদ্যসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত করা, পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য রফতানি ইত্যাদি— এই নারকীয় ঘটনা ঘটতে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল। কিছু ইতিহাসবিদ অবশ্য ব্রিটিশ সরকারের উপর পুরো দায় চাপাতে নারাজ। তাঁদের মতে, মন্বন্তর হয়েছিল মূলত প্রাকৃতিক কারণে।

মন্বন্তরের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা জরুরি হলেও তা গবেষকদের কাজ— সেই আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। কিন্তু আজ যদি মন্বন্তরের স্বরূপ বোঝার জন্য ফিরে দেখতে চাই সেই রক্তাক্ত সময়টাকে, বুঝতে চাই সেই সময়ের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে, তা হলে? মন্বন্তর-বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করা যেতে পারে। ভাবা যেতে পারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আর্কাইভস-এ কাজ করার কথাও। কিন্তু, এর বাইরে আরও একটি নির্ভরযোগ্য উপায় আছে। সেটি হল গত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের বাংলা সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পের কাছে ফিরে যাওয়া।

মন্বন্তর বলতে আমাদের প্রথমেই যা মনে পড়ে, তা হল তীব্র খাদ্য সঙ্কট, অন্নাভাব, চালের কালোবাজারি আর সর্বহারাদের হাহাকার 'ফ্যান দাও'। যে গল্পগুলির মধ্যে এই খাদ্য সঙ্কটের বীভৎস ছবি উঠে আসে সেগুলি হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুঙ্করা', 'নক্রচরিত', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাড়ে সাত সের চাল', 'ছিনিয়ে খায় না কেন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কালনাগ', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'আগুন' প্রভৃতি। খাদ্য সঙ্কটে কতটা করুণ পরিস্থিতি হয়েছিল গ্রাম বাংলার? 'পুঙ্করা' থেকে উদাহরণ পেশ করা যাক। আশেপাশে বহু গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক লেগেছে— দেবীর কোপ শান্ত করার জন্য তাই শুক্লা চতুর্দশীর রাতে শ্মশানে তর্করত্ন কালীপুজোয় বসেছেন। দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়েছে, সেই ভোগ দেবী শেয়াল রূপ ধারণ করে এসে গ্রহণ করবেন, সে রকমই আশা করছেন তর্করত্ন। তা না হলে, "পুঙ্করা পাবে। কারো রক্ষা থাকবে না।" কিন্তু অনেক অপেক্ষার পরও শেয়াল আসে না। পরিবর্তে 'এক মাথা ঝাকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি' হঠাৎই শূন্য থেকে উদয় হয়ে গোগ্রাসে শিবাভোগ খেতে থাকে। তর্করত্নর মনে হয় মৃত্যুর উৎসবের মধ্যে দেবী মূর্তি ধরে নেমে এসেছেন। গল্পের শেষে দেখি কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার রাতে (অর্থাৎ শ্মশানে পুজোর পরের দিনে) গ্রামের রাস্তায় আকালে স্বামী-সন্তান হারিয়ে শোকে উন্মাদ হয়ে যাওয়া এক নারী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে— 'দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারেনি'।

১৯৪৩-এ বাংলায় কেবল তীব্র খাদ্যাভাবই তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছিল ভয়ঙ্কর বস্ত্রাভাবও (ক্লথ ফ্যামিন)। বস্তুত, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে কাপড়ের মোট ঘাটতি ছিল ১৪০ কোটি গজ। এর ফলে, ১৯৪৩ সালের মে মাসে সুতির কাপড়ের দাম, ১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসের তুলনায়, প্রায় ৪২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বস্ত্রাভাবের ভয়ঙ্কর ছবি আমরা প্রত্যক্ষ করি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুঃশাসনীয়', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বরো বাগদিনী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বস্ত্র', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আবরণ'-সহ আরও বেশ কিছু গল্পে।

বস্ত্রাভাবে মানুষের যে কী ভয়ঙ্কর দুর্দশা হয়েছিল সেটা কেবল 'দুঃশাসনীয়' থেকেই টের পাওয়া যায়। গল্পে দেখি হাতিপুরের দরিদ্র ঘরের মেয়েদের গায়ে লটকানো থাকে এক ফালি ন্যাকড়া। সেই রকমই এক দরিদ্র ঘরের বৌ রাবেয়া তাঁর স্বামী আনোয়ারকে শাসায়, "আজ যদি না কাপড় আনবে তো... পুকুরে ডুববা।" কাপড়ের খোঁজে জনতার সঙ্গে আনোয়ার যায় কাঁথি সড়কের বাস-থামা মোড়ে, কারণ বাসে করে শহর থেকে ফেরার কথা গ্রামের প্রধান সুরেন ঘোষ আর আবদুল আজিজের। তারা উলঙ্গ হাতিপুরের কাপড় জোগাড় করার জন্য সদরে গেছেন। সুরেন ফেরেন, কিন্তু কাপড় না নিয়েই। কলকাতা থেকে নাকি 'মাল আসেনি'। কথাটা মিথ্যে বুঝতে পারে সবাই, কারণ কাপড়ের গাঁট বোঝাই এক লরি— যার সামনের সিটে বসে আজিজ এবং সুরেনের ভাই— তাদের সামনে দিয়ে চলে যায়। বাড়িতে ফিরে রাবেয়াকে দুঃসংবাদ দেয় আনোয়ার। রাবেয়া 'ফুঁসে না, শাসায় না, খোচায় না'। আনোয়ারকে খাইয়ে সে সানকি আর কলসি নিয়ে ঘাটে যায়। তার পর একটা পাথর ভরা বস্তার ভিতর মাথাটা ঢুকিয়ে গলায় বস্তার মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে 'পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে [পড়ে]'।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অর্থনৈতিক সঙ্কট নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের অতল অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে বার বার। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। এবং সে কারণেই, মন্বন্তরের সামাজিক অভিঘাতের আলোচনায়, 'রুইনড উইমেনহুড' শব্দবন্ধটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় অল্পবয়সি মেয়েদের একটি বড় অংশের ঠিকানা হত যৌনপল্লি। লিজি কলিংহ্যামের *টেস্ট অব ওয়ার: ওয়ার্ল্ড ওয়ার ২ অ্যান্ড দ্য ব্যাটল ফর ফুড* (২০১২) বইতে দেখানো হয়েছে, দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবারগুলি তাদের অল্পবয়সি মেয়েদের ধনী জমির মালিকদের কাছে খুব অল্প টাকা বা চালের বিনিময়ে পাঠিয়ে দিত।

মেয়েদের অতল অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আখ্যানই উঠে এসেছে প্রবোধকুমার সান্যালের 'অঙ্গার'-এ। গল্পটি এক নিম্নবিত্ত পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়। পরিবারটির সদস্য-সংখ্যা পাঁচ— কথকের পিসিমা, পিসিমার দুই কন্যা শোভনা (বিধবা) ও মিনু, এবং দুই পুত্র নুটু এবং হারু। যুদ্ধ, মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ তাদের বাধ্য করে ফরিদপুরের ছোট্ট বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসতে। তাদের ঠিকানা হয় বৌবাজারের একটি 'মেসবাসা'। গল্প যত এগোয় তত পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করে চরম অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখোমুখি পরিবারটি। আর সেই সঙ্কটের সঙ্গে যুঝতে, পেটে অন্ন জোগাতে শোভনা ও মিনু, দু'জনেই, মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে সমাজ-নীতিভ্রষ্ট হয়েছে। 'সুখী পরিবার'টি, মহানগরের আরও বহু সুখী পরিবারের মতো, 'পেটের আগুনে' পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে। 'অঙ্গার' ছাড়াও দুর্ভিক্ষে মেয়েদের করুণ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রসাভাস', রমাপদ চৌধুরীর 'গত যুদ্ধের ইতিহাস' এবং আরও বেশ কিছু গল্পে।

এই সমস্ত গল্প পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হওয়া বাংলার টুকরো টুকরো ছবি। বুঝতে পারি মন্বন্তরে হয়তো ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা বেঁচে থেকেও আসলে মরে গিয়েছিলেন, দগ্ধ হয়ে পরিণত হয়েছিলেন ভস্মে, সেই সংখ্যাটি ধরলে মন্বন্তরের শিকার ত্রিশ লক্ষের কয়েক গুণ।

একটা প্রশ্ন মনে আসে। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের যে সমস্ত সামাজিক সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়েছিল বাঙালি, সেগুলি যেমন ধরা পড়েছিল সেই সময়ের লেখকদের লেখায় প্রায় নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মতো— তেমনই ভয়ঙ্কর অতিমারি, তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অসাম্য, সাম্প্রদায়িক হিংসার মতো সমসময়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি আজকের লেখকদের লেখায় পর্যাপ্ত ভাবে ধরা পড়ছে তো? না কি সাহিত্য বলতে এখন আমরা কেবলই বুঝি প্রেম, থ্রিলার, তন্ত্র-মন্ত্র-হরর এবং ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প? ২০২১-এ একটি সর্বভারতীয় বাংলা সংবাদ চ্যানেল আয়োজিত বিতর্কসভায় সমরেশ মজুমদার আক্ষেপ করেছিলেন, "গত কুড়ি বছরে বাংলা ভাষায় যত গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে... তার একটিও রাজনৈতিক গল্প-উপন্যাস নয়।" সত্যিই যদি সমকালের রাজনীতি-অর্থনীতি ছাপ না ফেলে এখনকার বাংলা সাহিত্যে, সেটা নিশ্চিত দুর্ভাগ্যের। ভুললে চলবে না যে, মনোরঞ্জন করার পাশাপাশি সার্থক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কর্তব্য সমসময়কে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা।

অর্থনীতি বিভাগ, শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়